দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 30 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সরকারী বনাম বেসরকারী স্কুলের পাস-ফেল দ্বন্দ্ব

আফতাব চৌধুরী

গেল মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শোরগোলও শুরু হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, উচ্চ বেতনভোগী সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা নাকি দায়িত্বহীন এবং ফাঁকিবাজ তাই তো ছাত্রদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। অন্যদিকে, নামমাত্র বেতন পেয়েও শুধু দায়বদ্ধতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর সফলতার জয়জয়কার। বিগত ক'টি বছর থেকে ফল প্রকাশের পরক্ষণেই এমনতর কথা সাধারণ দোকানদার থেকে শুরু করে নামী-দামী বুদ্ধিজীবীসহ প্রায় সকল স্তরেই আলোড়ন তোলে। আবার অত্যল্প দিনের মধ্যেই সবকিছু নিস্তরঙ্গ ও স্থির হয়ে যায়। এ কথা কেউই অস্বীকার করবে না যে, চূড়ান্ত ফলাফল একটি বিদ্যালয়ের বিদ্যায়তনিক সাফল্যের নির্ধারক মানদণ্ড। আবার এ কথাও সত্যি যে, বিগত কয়েক বছর ধরে ফলাফলের যে চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে তাতে সরকারী বিদ্যালয়ের সাফল্যের খতিয়ান অনেক উর্ধ্বে দৃষ্ট হচ্ছে। গড্ডালিকা প্রবাহের মতো আলটপকা কিছু মন্তব্য না করে তার কারণ অনুসন্ধানসহ প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখা যাক।

আশা করি, সবাই একমত হবেন যে, এদেশে আধুনিক বিদ্যালয়ের ধ্যান-ধারণা, পরিকাঠামোর জন্ম মূলত ব্রিটিশ আমলে কিছুটা খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে, কিছুটা ব্রিটিশ শাসকদের প্রয়োজনে আর বাকিটা স্বদেশী নবজাগরণের পথিকৃৎদের হাত ধরে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বেশীর ভাগ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে হয়ত বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় নয়ত জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে যা পরবর্তীকালে বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত ও গণ্য হয়েছে। যেভাবেই হোক বা যাদের উদ্যোগেই হোক না কেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তার, মেধা শক্তির বিকাশ ও মানব সম্পদের মানোন্নয়ন। এ জন্যই সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে।

পাঠ্যক্রম অনুসারে বিদ্যালয়গুলোকে শ্রেণী বিন্যাস করলে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। (ক) সরকারী বিদ্যালয়, (খ) অমঞ্জুরিকৃত বা আংশিক অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং (গ) বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যালয়। এগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি স্তরের বিদ্যালয়গুলোই সরকারী বিদ্যালয় বলে গণ্য হচ্ছে, কেন না এগুলো সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট ভাল। (খ) স্তরের বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামোসহ শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। সরকারী মঞ্জুরি প্রাপ্তি বা বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির আশায় বছরের পর বছর অতিক্রম করে শিক্ষাকর্মীরা অমৃতলোকে পাড়ি দিচ্ছেন। তবুও ওরা দায়িত্ব পালনের মহড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। আর (গ) স্তরের বিদ্যালয়গুলো এক কথায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। যাদের প্রথম ও শেষ কথা ব্যবসায়িক সাফল্য ও অধিক মুনাফা। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকের মাস মাইনের কোনও কাঠামো নেই। মালিকের বদান্যতায় ছিটেফোঁটায় যা জোটে তাই প্রাপ্য। পোষায় তো থাক নইলে রাস্তা দেখ। সত্যি করে বলতে গেলে সেখানে কর্মীরা যেন সবাই 'বন্ডেড লেবার' তবু কেন শিক্ষিতজনেরা ওখানে কাজ করছে, তার কারণ প্রধানত দুটি (ক) পেটের খিদে আর (খ) একটি ব্যবসায়িক অনুজ্ঞাপত্র নিয়ে নেয়া, যার সাহায্যে গৃহশিক্ষকতার বাজারে নিজেদের দর ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা সহজ হয়। আর এ কথা তো সত্য যে, প্রাইভেট স্কুল বা ইংরেজী মাধ্যমিক ছাত্রদের গৃহশিক্ষকদের ফি মাতৃভাষার বিদ্যালয় ছাত্র পড়ানোর তুলনায় অনেক বেশী।

আমাদের এ দেশে প্রাইভেট স্কুলের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। প্রথম দিকে বড় বড় শহরে এদের সংখ্যা ছিল একটি বা দুটি। সাধারণত ভিন্ন ভাষা-ভাষীর ছাত্ররা এসব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। বর্তমানে দর্শনীয়ভাবে এদের সংখ্যা শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই নয় ক্রমে ক্রমে তা ছোট শহর থেকে গঞ্জ-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। এ বাড়-বাড়ন্তের পেছনে যে ম্যাজিকটা কাজ করছে তা হল, আমাদের ক্যারিয়ারিস্ট হয়ে ওঠার মানসিকতা, আর এক্ষেত্রে ইংরেজী মাধ্যমই এর একমাত্র সহায়ক বলে অন্ধবিশ্বাসী হয়ে ওঠা। ফলে নিম্নবিত্ত একটি পরিবারও যদি নেহাৎ পল্লীগ্রামে না থাকেন তো নিজের কোলের শিশুকে টেনে-হ্যাঁচড়ে নিয়ে ছুটছেন এদের দোরগোড়ায়। আর ঠিক এ দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা তাদের পসার বাড়িয়ে চলেছে গ্রামে গ্রামান্তরে। যাদের মূল লক্ষ্য আরও ব্যবসা আরও মুনাফা। এখানে কিন্তু কোনও সামাজিক দায়বদ্ধতার স্থান নেই, যা আছে তা হল ছাত্রের ঝাড়াই বাছাই অর্থাৎ 'আইকিউ টেস্ট' এবং অভিভাবকদের শৈক্ষিক, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থার (Status) বিচার। সরকারও মূলত যে দুটি প্রধান কারণে এদের ঢালাও অনুমতি দিয়ে যাচ্ছেন, তা হল প্রথমত শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় অধিগ্রহণের চাপ থেকে কিছুটা মুক্ত হওয়াসহ জনগণকে প্রাইভেট বিদ্যালয়মুখী হতে পরোক্ষ উৎসাহিত করা এবং দ্বিতীয় কারণ হল, বেকারদের চাপ থেকে আংশিক হলেও রেহাই পাওয়া।

যতদূর মনে পড়ছে, দেশে ক' বছর আগেও মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকে গড় পাসের হার সাধারণত ৪০ থেকে ৬০ শতাংশের আশপাশেই থাকত। তাতেই কিন্তু সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক হত। তবে তুলনামূলকভাবে গ্রাম থেকে শহরের ফল ভল হত। তখন কিন্তু একই পর্যায়ভুক্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে তুলনা করে ভাল মন্দ বিচার করা হত। সার্বিকভাবে এসব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরাই তখন মেধা তালিকায় স্থান দখল করত। এমনকি বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রথম দিকেও মেধা তালিকায় সরকারী বিদ্যালয়ের অবস্থান যথেষ্ট ভাল ছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর নয়ের দশক থেকে চিত্রটা বদলাতে শুরু করে বর্তমানে তা প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। এ পট পরিবর্তনের কারণ গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারলে সরকারী বিদ্যালয়ের অবনমন কাটিয়ে ওঠা তো সম্ভব হবেই না বরং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা বণিককুলের বাজারে পর্যবসিত হবে। যার ফলে এ দেশের দীন-দরিদ্র আমজনতার কাছে শিক্ষা 'টক আঙ্গুর' হয়ে থাকবে।

বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক নামক তিনটি বাহুর পারস্পরিক সহযোগিতার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ একটি ত্রিভুজ। আর যে চালিকাশক্তি ও বেষ্টনিকে সুসংবদ্ধ করে ধরে রাখে তা অবশ্যই প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থা। বর্তমানে বিশেষ করে সরকারী বিদ্যালয়ে যা বড়ই দুর্লভ। শিক্ষা ক্ষেত্রের বা বিদ্যালয়ের গোড়ার এ গলদ যতক্ষণ না সারিয়ে তোলা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও দাওয়াই-ই কাজে আসবে না। সুতরাং পরস্পরকে দোষারোপ না করে বা সস্তা জনপ্রিয়তার বাহবা কুড়ানোর জন্য বড় বড় কথা না বলে সকল পক্ষকেই এ দুরবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য সচেষ্ট পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় কেবল বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করে বা শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করে কিছুই লাভ হবে না, যা হবে তা হলো, সমাজের বৃহৎ অংশের কাছে শিক্ষার আলোকবর্তিকা চিরকালের মতো অচ্ছুৎ থেকেই যাবে। কোনো 'পরিকল্পনা' বা 'মিশন' এ সর্বনাশা অন্ধকার ভেদ করতে পারবে না।

এ মুহূর্তে দেশের সিলেট জেলার জৈন্তাপুর থানায় গৌরবোজ্জ্বল সরকারী হাইস্কুলের ফলাফলের সঙ্গে মাত্র ক'কিলোমিটার দূর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ফলাফলের দিকে তাকানো যাক। দেখা যাবে সরকারী স্কুলের এবারকার করুণ ফলাফল বেসরকারী স্কুলের ফলাফলের সঙ্গে কত বেশী ফারাক। একটি গৌরবোজ্জ্বল সরকারী বিদ্যালয়ের এবারকার করুণ ফলাফল আমাদের সার্বিক লাগাতার অনীহা, উপেক্ষা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অক্ষমতা ও অব্যবস্থার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

যদিও তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন বলে খবর মিলেছে, তবুও তাদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কেননা, ক'বছর আগেও এ বিদ্যালয় নিয়ে এমনতর উদ্যোগ অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেছে। তাছাড়া, লাখ টাকার যে প্রশ্নটি এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মনে উঁকি মারছে তা হলো, উদ্যোগীদের পুত্র-কন্যারা সরকারী বিদ্যালয়ের ছত্রছায়ায় পাঠ নিচ্ছেন না। নেবেন? উত্তরটা যদি নেতিবাচক হয় তো একে মিথ্যা নষ্টালজিক ম্যানিয়া বলে ধরে নিতে হবে। তাই নয় কি?

যদি গ্রাম অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকাই দেখবো প্রায় সবক'টি সরকারী বিদ্যালয়ই একদিকে যেমন ছাত্রভারে ভারাক্রান্ত অন্যদিকে শিক্ষক স্বল্পতায় এক দশকের চেয়েও বেশী সময় ধরে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর যাকে বলা হয় বিদ্যালয়ের কাণ্ডারী সে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষরা তো ভারপ্রাপ্ত মাঝি। যাদের অনেকেরই যোগ্যতা বা দক্ষতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এভাবে জোড়াতালি মেরে এগুলো যে কতদিন চলবে তা কিন্তু স্বয়ং সরকারেরও জানা নেই, গ্রামীণ জনগণ তো কোন ছার! তার ওপর দশ থেকে পনের শতাংশ ছাত্রছাত্রী ছাড়া এসব স্কুলে বাদবাকী ছাত্রদের পারিবারিক বা আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ও দুর্বল। এরূপ অবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে খাবি খেয়েই যাচ্ছে। তাছাড়াও বিদ্যালয় সরকারীকরণের দৌলতে শিক্ষক সমাজে যে বেনোজলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার দাপটে এ সকল বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের দুর্ঘট আরো যে ত্বরান্বিত করে তুলেছে, সরকারী বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ফলাফল তো তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।